

পঞ্চম অধ্যায়

বনায়ন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বনভূমিতে গাছ লাগানো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণকে বলা হয় বনায়ন। বনায়নের ফলে বনভূমি হতে সর্বাধিক বনজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বসতবাড়ি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সড়ক ও বাঁধের ধার, পাহাড়ি অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত উপায়ে সৃজিত বনায়নকে বলা হয় সামাজিক বনায়ন।

বাস উপযোগী পরিবেশ তৈরি ও তা সংরক্ষণে বনের ভূমিকা অপরিসীম। কোনো দেশের বা অঞ্চলের বিস্তৃর্ণ এলাকাজুড়ে বড় বড় বৃক্ষরাজি ও লতা-গুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বনকেই বনভূমি বলা হয়। এসব বনভূমি কখনো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয় ও গড়ে ওঠে। আবার কখনো মানুষ তার প্রয়োজনে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সরকারি হিসাবমতে, বর্তমানে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১৭ ভাগ। ইউনেস্কোর মতে বর্তমানে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ শুধুমাত্র ১০ ভাগ। এ অধ্যায়ে আমরা আমাদের দেশের বনাঞ্চলের বিস্তৃতি, ধরন এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব। এছাড়াও বন সংরক্ষণ বিধি, বন নার্সারি, বন নার্সারির বীজ, বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ এবং উপকূলীয় বনায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের নাম উল্লেখ করতে পারব;
- বিভিন্ন বনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- বন সংরক্ষণ বিধি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বন নার্সারি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বন নার্সারির বীজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- বন নার্সারি তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তক্তা বা কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- গোল কাঠ বা তক্তা পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উপকূলীয় বনায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উপকূলীয় বনায়নের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের বিস্তৃতি

বন একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি হিসাবমতে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির আয়তন প্রায় ৩১.০৪ লক্ষ হেক্টর। বনভূমির এ পরিমাণ দেশের মোট ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ। এই বন সারাদেশে সমানভাবে বিস্তৃত নয়। অধিকাংশ বনভূমি দেশের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ খুবই কম।

অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধরন

বনভূমির অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
ভাগগুলো হলো -

- ১। পাহাড়ি বন
- ২। সমতলভূমির বন
- ৩। ম্যানগ্রোভ বন
- ৪। গ্রামীণ বন
- ৫। সামাজিক বন
- ৬। কৃষি বন

নিচের ছকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ দেখানো হলো—
অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চল (লক্ষ হেক্টর)

বনের ধরন	প্রাকৃতিক বন	কৃত্রিম বা সৃজিত বন	মোট
পাহাড়ি বন	১১.০৬	২.১০	১৩.৭৭
ম্যানগ্রোভ বন	৬.১৬	১.৩৪	৭.৫০
সমতল ভূমির বন	০.৮৭	০.৩৬	১.২৩
গ্রামীণ বন	-	২.৭০	২.৭০

বনাঞ্চলের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

১) পাহাড়ি বন

আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি বন অবস্থিত। বাংলাদেশের বন এলাকার অর্ধেকেরও বেশি এলাকাজুড়ে রয়েছে পাহাড়ি বন। কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে এ বন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

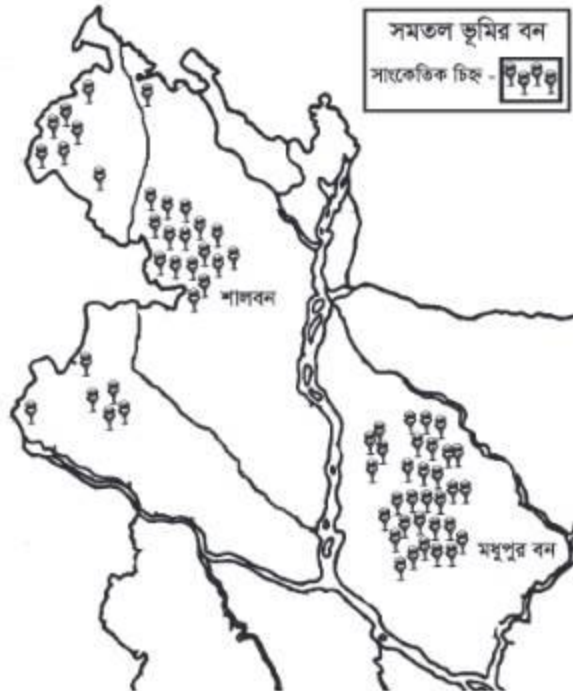
বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পাহাড়ি গাছ হচ্ছে - গর্জন, রাজকড়ই, চাপালিশ, তেলসুর, কড়ই, গামার, চম্পা, জাবুল, সেগুন, বন্য আম প্রভৃতি। পাহাড়ি বন এলাকায় নানা ধরনের বাঁশও জন্মে থাকে। এসব বাঁশের মধ্যে বরাক, মূলী, উরা, মরাল, তল্লা, কেইট্টা, নালা প্রভৃতি। পাহাড়ি বনাঞ্চলে হাতি, বানর, শুকর, ভালুক, বনমুরগি, শিয়াল, নেকড়ে, কাঠবিড়ালি প্রভৃতি বন্যপ্রাণী বাস করে। বিভিন্ন রকমের পাখি ও কীটপতঙ্গ পাহাড়ি বনাঞ্চলে দেখা যায়। বড় বড় গাছপালা ছাড়াও লতা-গুলাসহ অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ পাহাড়ি বনাঞ্চলে জন্মে থাকে। দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু ও পরিবেশের উপর পাহাড়ি বনের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এ বনের পরিমাণ ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর।



চিত্র : পাহাড়ি বন

২) সমতলভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা অঞ্চলের বনকে সমতল ভূমির বন বলে। এ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ শাল ও গজারি, এছাড়া কড়ই, রেইনট্রি, জাবুল ইত্যাদি বৃক্ষও এ বনে জন্মে থাকে। সমতলভূমির প্রাকৃতিক বনের কাছাকাছি বসতি থাকায় এ বনের উপর মানুষের চাপ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক স্থান বনশূন্য হয়ে পড়েছে। সরকারিভাবে এসব এলাকায় সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্থানে সামাজিক বনায়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ বনের শাল কাঠ খুবই উন্নতমানের হয়ে থাকে। গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরি ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে শাল কাঠের ব্যবহার করা হয়। এ বনের বন্যপ্রাণী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অল্পসংখ্যক নেকড়ে, হরিণ, বানর, সাপ, ঘুঘু, দোয়েল ও শালিক দেখা যায়। এ বনের মোট পরিমাণ ৩.৮৬ লক্ষ হেক্টর।



চিত্র : সমতলভূমির বন

৩) ম্যানগ্রোভ বন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এ বন অবস্থিত। প্রত্যহ সামুদ্রিক জোয়ারের পানিতে এ বন প্লাবিত হয় বলে একে গোনা পানির বনও বলা হয়। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণের বিস্তৃত এলাকা ম্যানগ্রোভ বনে পরিচিত। এ বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী। সুন্দরী বৃক্ষের নামানুসারে এ বনের নামকরণ করা হয়েছে সুন্দরবন। এ বনের অধিকাংশ উদ্ভিদের শ্বাসমূল রয়েছে। যার সাহায্যে এরা শ্বসন ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। কারণ জলাবদ্ধ মাটি থেকে সাধারণ মূলের পক্ষে অক্সিজেন গ্রহণ সম্ভব নয়। এ বনের গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ হলো - গেওয়া, গরান, পশুর, কেওয়া, বাইন, কাকড়া, গোলপাতা ও মোটা বেত। বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এ বনে বাস করে। চিতাবাঘ, হরিণ, বানর, অজগর, বিচিত্র

রকমের পাখি ও কীট-পতঙ্গ এ বনে বাস করে। সুন্দর বনের নদী ও খালে কুমির ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বাস করে। প্রতি বছর সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু ও মোম পাওয়া যায়। সুন্দরবন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ও সম্পদশালী ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন। এ বনের মোট আয়তন ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের ৩টি জায়গায় ম্যানগ্রোভ বনভূমি রয়েছে। যথা- ১। চকোরিয়া সুন্দরবন ২। টেকনাফ উপকূল ৩। বৃহত্তর খুলনার সুন্দরবন।



চিত্র : ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)

৪) গ্রামীণ বন

বাংলাদেশে প্রায় ৭.৭৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে গ্রামীণ বন রয়েছে। মানুষ বসতভিটা, পুকুর, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পাশে এসব বন গড়ে তোলে।

কাজ-১ বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নিচের ছকের কাজটি পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করবে।

বনের নাম	অবস্থান	উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ	বসবাসকারী প্রাণী
১। পাহাড়ি বন			
২। সমতল ভূমির বন			
৩। ম্যানগ্রোভ বন			

কাজ-২ শিক্ষার্থীরা মানচিত্র দেখে বিভিন্ন বনের অবস্থান চিহ্নিত করবে।

বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ

জরিপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বনে মজুদ থাকা কাঠের পরিমাণকে গ্রোয়িং স্টক বলা হয়। এই গ্রোয়িং স্টক এর পরিমাণের উপর ভিত্তি করেই বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন বনভূমিতে সমীক্ষায় প্রাপ্ত কাঠের পরিমাণ নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো।

বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ

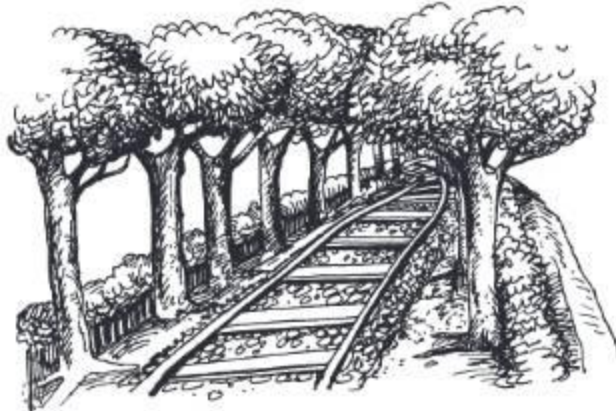
বনের ধরন	মজুদ কাঠের পরিমাণ মিলিয়ন* ঘন মিটার
পাহাড়ি বন	২০.৭১
ম্যানগ্রোভ বন	১২.৩২
সমতল ভূমির বন	১.২০
গ্রামীণ বন	৫৪.৬৮
মোট	৮৮.৯১

* মিলিয়ন = ১০ লক্ষ

৫) সামাজিক বন

সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণে যে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়, তাকেই সামাজিক বনায়ন বলা হয়।

বাংলাদেশের বন বিভাগ এরই মধ্যে উপকূলীয় চরাঞ্চলসমূহে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার জলাশয় থেকেই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এতে জনসাধারণ সরাসরি অংশগ্রহণ করছে এবং উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সকল সড়ক, মহাসড়ক ও রেললাইনের পাশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানত উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে সামাজিক বন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।



চিত্র : সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

- ১। গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্য কাঠের জোগান দান ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি পূরণ।
- ২। পতিত জমি, বসতভিটা, সড়ক, রেলপথ, বাঁধ, খাল বিল ও নদীর পাড়ে, বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানে বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ।
- ৩। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো এবং দারিদ্র্য বিমোচন।
- ৪। পশুখাদ্য, শাকসবজি, ফলমূল, ভেষজ ও বিনোদনের জন্য বন সৃজন।
- ৫। বন উৎপাদিত কাঁচামাল গ্রামীণ কুটির শিল্পে সরবরাহ করা ও জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- ৬। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও মরুবিস্তার রোধ করা। ভূমিক্ষয় রোধ করা।
- ৭। জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।

কাজ : দলগত কাজ

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তার ম্যাপ পোস্টার কাগজে তৈরি করো।



৬) কৃষি বন

পরিবেশ বাঁচানো, জ্বালানি সরবরাহ, কাঠ ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষি বনের প্রসার ঘটছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে কৃষি বনায়ন পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটছে। কৃষি বনায়ন হলো কোনো জমি থেকে একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন গাছ, ফসল ও পশুপাখি উৎপাদন ব্যবস্থা। সাধারণভাবে কৃষি বনায়ন হচ্ছে এক ধরনের সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এতে কৃষি ফসল, পশু, মৎস্য এবং অন্যান্য কৃষি ব্যবস্থা সহযোগে বহু বর্ষজীবী কাঠল উদ্ভিদ জন্মানোর ব্যবস্থা করা হয়।

কৃষি বনায়নের বৈশিষ্ট্য

- ১। একই জমি বারবার ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।
- ২। বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও ফসলের সমাহার ঘটায় উৎপাদন ঝুঁকি কমে যায়।
- ৩। খামারের উৎপাদন স্থায়ীত্বশীল হয় ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে।
- ৪। সামাজিক ও পরিবেশগত গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।
- ৫। প্রাকৃতিক ভূমিজ সম্পদ ব্যবহার হয়।
- ৬। স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারে সুযোগ থাকে।
- ৭। ফসল খামার মালিক, মিশ্র খামার মালিক ও বন বাগান মালিকের চাহিদা পূরণ হয়।
- ৮। কৃষি বনে উৎপাদিত দ্রব্যাদি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যায়।

কৃষি বনায়ন : পদ্ধতি ও প্রকার

- ১। ফসলবন : বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাছ ও আন্তঃফসল সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন।
- ২। তৃণবন : মিশ্র খামার হয়ে থাকে। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন।
- ৩। কৃষি তৃণবন : ফসলের জোড় চাষ। মাঝে মাঝে বনজ গাছের উৎপাদন করা যায়।
- ৪। কৃষিবন মৎস্য খামার : মিশ্র খামার করা যায়। উঁচু নিচু জমি সমন্বয়ে খামার স্থাপন করতে হয়। ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ও মৎস্য উৎপাদন করা যায়।

কৃষিবনের প্রয়োজনীয়তা

- ১। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- ২। খাদ্যের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।
- ৩। ফসলি জমির বহুবিধ ব্যবহার করে উৎপাদন ঝুঁকি কমিয়ে আনা।
- ৪। বিরাট জনগোষ্ঠীর কাজের ব্যবস্থা করা ও দারিদ্র্য হটানো।
- ৫। এলাকাভিত্তিক কৃষি বাজার তৈরি করে গ্রামীণ জনজীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন।
- ৬। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
- ৭। কৃষি গবেষণার ফলাফলভিত্তিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।
- ৮। মাটির-উর্বরতা বৃদ্ধি করা এবং মাটিক্ষয় রোধ করা।
- ৯। পশুখাদ্য উৎপাদন এবং পশু পাখি ও উপকারী কীট পতঙ্গের নিরাপদ আবাস তৈরি করা।
- ১০। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে দুইটি করে বনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি

বন সংরক্ষণ বিধি

বনভূমির সকল লতাগুল্ম, বৃক্ষরাজি ও বন্যপ্রাণী নিয়ে বনজ সম্পদ গঠিত। এ বনজ সম্পদ একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বনভূমির এসব গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে নিবিড় আন্তঃসম্পর্ক বিরাজমান। কোনো কারণে এর যেকোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যগুলোও আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যায়। কোনো অঞ্চলে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি বা সরকারি বনাঞ্চল থেকে গাছ কাটা, অপসারণ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধান রয়েছে। এসব আইন বা বিধানকে বন বিধি বা বন আইন বলা হয়। বনভূমির সকল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য এ উপমহাদেশে ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষণ আইন করা হয় যা ‘বন আইন, ১৯২৭’ নামে পরিচিত। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে এ আইনের বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন

করে যা 'বন আইন (সংশোধন), ১৯৯০' নামে পরিচিত। এ আইনের পর অবৈধ বন ধ্বংসের প্রবণতা কমে বটে কিন্তু পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ১৯৯০ সালের এ আইনকে সময় উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে এ আইনের আরও কিছু সংশোধনী আনা হয়। এ আইন বলে বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এসব বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বনবিধি বলে আরও যা করতে পারবেন তা হলো-

- ১। সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোনো বনভূমিতে সংরক্ষিত বন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।
- ২। এ প্রজ্ঞাপন বলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা অন্যকোনো দাবিদার প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হতে ন্যূনতম তিন মাস এবং অনধিক চার মাসের মধ্যে বন কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে নিজে হাজির হয়ে ক্ষতির বিস্তারিত উল্লেখ করে আবেদন করতে পারবেন।
- ৩। সরকার একইভাবে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখ হতে সংরক্ষিত কোনো বন বা তার অংশ বিশেষ সংরক্ষিত, রহিত এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

বনবিধির বর্ণনা

এসো আমরা এবার বন সংরক্ষণের প্রচলিত আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ জেনে নিই। এ বিধি বলে নিম্নলিখিত কাজসমূহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। যথা-

- ১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সরকারি বনভূমি থেকে গাছপালা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করা।
- ২। অনুমতি ব্যতীত আধাসরকারি বা স্থানীয় সরকারি জমি বা স্থায়ী ক্রয়কৃত সংস্থা বা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব জমি বা বাগান হতে কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ জেলার যেকোনো স্থানে প্রেরণ।
- ৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশ করা, বনভূমিতে ঘরবাড়ি ও চাষাবাদ করে বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করা।
- ৪। বনাঞ্চলে গবাদি পশু চরানো।
- ৫। প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতীত বনের গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহন করা।
- ৬। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ঋতু ব্যতীত অন্য সময়ে আগুন জ্বালানো, আগুন রাখা বা বহন করা।
- ৭। বনের কাঠ কাটার অথবা কাঠ অপসারণের সময় অসাবধানতাবশত বনের ক্ষতিসাধন করা, গাছ ছেঁটে ফেলা, ছিদ্র করা, বাকল তোলা, পাতা ছেঁড়া, পুড়িয়ে ফেলা অথবা অন্য কোনো প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করা।
- ৮। বনে শিকার করা, গুলি করা, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা অথবা বনে ফাঁদ পাতা।
- ৯। বনজ দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অপসারণ, পরিবহন ও হস্তান্তর করা।
- ১০। বন কর্মকর্তা অথবা বন রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজে বাধা প্রদান করা।

১১। যথাযথ অনুমতি ব্যতীত বনের মধ্যে গর্ত খোঁড়া, চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ানো অথবা কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো বনজাত পণ্য সংগ্রহ করা অথবা শিল্পজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করা, অপসারণ করা।

১২। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো সংরক্ষিত বনে আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করা।

বন আইন লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান

বন আইন লঙ্ঘনের বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। উপরোক্ত আইন ভঙ্গের জন্য ন্যূনতম ছয় মাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এসব অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হয়ে থাকে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সনে একটি আইন প্রণয়ন করেন যা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ), অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ নামে অভিহিত। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে যেকোনো উপায়ে বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, বন্যপ্রাণী প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি, জাতীয় উদ্যানের সীমানার এক মাইলের মধ্যে কোনো প্রাণী শিকার, বিদেশি প্রাণী আমদানি বা বিদেশে রপ্তানি করা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ আইন লঙ্ঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি লঙ্ঘনকারীকে আদালত ছয় মাসের জেলসহ পাঁচশত টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বৎসরের জেলসহ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন। এ আইন ভঙ্গকারীকে আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে মানুষের জীবন বাঁচাতে, ফসলের ক্ষতি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়।

কাজ : বন বিধি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি নিয়ে দলীয় আলোচনা কর। এ সম্পর্কীয় পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা

দেশের বিরাজমান বন সংরক্ষণ ও নতুন বন সৃষ্টি করে দেশে বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি। কারণ বন পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। এ অধিক জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য সীমিত বনজসম্পদের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ বনের বৃক্ষরাজি ও বন্য প্রাণী উজাড় করছে। বন ধ্বংস হওয়ার কারণে বন্য প্রাণীর আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, প্রজনন বিঘ্নিত হচ্ছে, খাদ্য সংকট হচ্ছে। অবৈধ শিকারির কবলে পড়েও বন্য প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। বনে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে। বনজসম্পদ চুরি ও পাচার করে এক শ্রেণির অসাধু লোক বন ধ্বংস করছে। বনের নিকটবর্তী এলাকাবাসী ধীরে ধীরে বন দখল করছে। বন এলাকায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে। অসাধু চক্র পার্বত্য এলাকার পাহাড় কেটে, কাঠ পাচার করে পাহাড়ি বন ধ্বংস করছে। এ ছাড়াও সামাজিক বন বৃক্ষরাজি আত্মসাৎ করছে। এর ফলে ভূমিক্ষয়, ভূমি ধ্বংসসহ নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। দেশ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বনজসম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বন সংরক্ষণ বিধি প্রণীত হয়েছে। এ বিধির কার্যকরী প্রয়োগে সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বনবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসংযোগ বাড়তে হবে। বন সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি বাস্তবায়িত হলে অনেক সুফল পাওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন নার্সারি

বন নার্সারি

আভিধানিক অর্থে বনজ নার্সারি হলো বা চারালয় চারা গাছ উৎপাদনের স্থান। নার্সারি হলো এমন একটি স্থান যেখানে চারা স্থানান্তর ও রোপণের পূর্ব পর্যন্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি আদর্শ নার্সারি থেকে সুস্থ-সবল ও সুন্দর চারা পাওয়া সম্ভব। নার্সারিতে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। আবার আধুনিক পদ্ধতিতে কলম থেকেও উন্নতমানের চারা উৎপাদন করা হয়।

নার্সারির প্রয়োজনীয়তা

এমন অনেক বীজ রয়েছে, যেগুলো গাছ থেকে ঝরে পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপণ করতে হয়। তা না হলে অঙ্কুরোদগমের হার কমতে থাকে। এসব প্রজাতির জন্য নার্সারি একান্ত অপরিহার্য। যেমন-গর্জন, শাল, রাবার, তেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপণ করতে হয়। ভালোমানের বাগান করতে প্রয়োজন উন্নতমানের সুস্থ, সবল চারা। এ ধরনের চারা নার্সারিতে তৈরি করা যায়। আরও যেসব কারণে নার্সারি অপরিহার্য তা হলো -

- সময়মতো উন্নতমানের সুস্থসবল ও বড় চারা পাওয়া যায়।
- বিভিন্ন বয়সের চারা বিপণন ও বিতরণে সুবিধা হয়।
- অনেক চারা একসাথে পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।
- কম পরিশ্রম ও কম খরচে চারা উৎপাদন করা যায়।
- স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প খরচে অনেক চারা পাওয়া যায়।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নার্সারির অবদান

- নার্সারিতে বনজ, ফলজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। এর ফলে বৃক্ষায়ন বৃদ্ধি পায়।
- নার্সারিতে কাজ করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।
- নার্সারি ব্যবসা করে অনেক লোকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
- নার্সারিতে উৎপাদিত চারা দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি বনায়ন করা হয়।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টিত তৈরিতে নার্সারিতে উৎপন্ন চারা রোপণ করা হয়।

বন নার্সারির ধরন

নার্সারির ধরন : নার্সারি বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন - ১. মাধ্যম ভিত্তিক ২. স্থায়িত্ব ভিত্তিক
৩. অর্ধনৈতিক ভিত্তিক ৪. ব্যবহার ভিত্তিক

১। মাধ্যম ভিত্তিক নার্সারি আবার দুই ধরনের

ক. পলিব্যাগ নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে পলিব্যাগে বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। পলিব্যাগ সহজে সরানো যায় বলে চারাকে খরা, বৃষ্টি ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা যায়। গাছ থেকে গাছে রোগ সংক্রমণ কম হয়। এ পদ্ধতিতে নিবিড়ভাবে চারার যত্ন নেওয়া যায়।

খ. বেড নার্সারি

নার্সারি তৈরির এ পদ্ধতিতে সরাসরি মাটিতে বেড তৈরি করে চারা উৎপাদন করা হয়। এ নার্সারিতে এক সাথে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক চারা তৈরি করা যায়। ফলে বীজের অপচয় কম হয়। দ্রুত বর্ধনশীল চারা উৎপাদন ভালো হয়। কাটিং ও মোথা থেকে চারা উৎপাদন সহজ হয়। চারা উৎপাদনের জন্য বেডের মাটি উর্বর হতে হয়।

২। স্থায়ী ভিত্তিক নার্সারি দুই ধরনের,

যেমন—

ক. স্থায়ী নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে বছরের পর বছর চারা উত্তোলন করার সুযোগ থাকে। স্থায়ী নার্সারির সুবিধা হলো নার্সারির জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন করা যায়। গ্রিন হাউজ ও বীজাগার নির্মাণ করা যায় তবে মূলধনের প্রয়োজন বেশি হয়। চারার পরিবহন খরচ বেশি হয়।

খ. অস্থায়ী নার্সারি

এ নার্সারিতে চাহিদা অনুযায়ী চারা উৎপাদন করা হয়। অসুবিধাটা হলো এ ধরনের নার্সারি সংরক্ষণে বেগ পেতে হয়।

৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নার্সারি দুই ধরনের,

যেমন—

ক. গার্হস্থ্য নার্সারি

পারিবারিক প্রয়োজন অনুযায়ী ফুল, ফল ও কাঠের চারা উত্তোলন করা হয়।

খ. ব্যবসায়িক নার্সারি

এ নার্সারিতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ফল, সবজি, ফুল, কাঠ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উত্তোলন করে বিক্রয় ও সরবরাহ করা হয়।

৪। ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারি

উদ্ভিদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের নার্সারি করা হয়। যেমন- মেহগনি, সেগুন, রেইনট্রি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য তৈরি নার্সারি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে বন নার্সারি পরিদর্শন করে বৃক্ষের তালিকা তৈরি করবে।

বন নার্সারির বীজ

বনজ উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজ হলো উদ্ভিদের প্রধান বংশ বিস্তারক উপকরণ। ভালো চারা পেতে হলে ভালো বীজ প্রয়োজন। এ জন্য নির্দিষ্ট গুণাগুণসম্পন্ন মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ আহরণ থেকে রোপণের পূর্ব

পর্যন্ত সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলে বীজ পোকা-মাকড়, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি দিয়ে আক্রান্ত হয়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। তাছাড়া বীজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এর গুণাগুণ নির্ণয় করতে হবে। বীজকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরণের পর বাজারজাতকরণ ও বিতরণ করা দরকার। এ পাঠে আমরা নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি, বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি, বীজ পরীক্ষা ও বীজ বপন পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে জানব।

মাতৃগাছ নির্বাচন : মধ্য বয়সী, সুস্থসবল, রোগমুক্ত এবং অধিক ফল উৎপাদনকারী গাছকে নির্বাচন করা। নির্বাচিত এসব গাছ থেকে উপযুক্ত সময়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ভালো চারা উৎপাদনের জন্য উত্তম গুণাগুণসম্পন্ন মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা অপরিহার্য। আমাদের দেশে এক বা একাধিক উৎস হতে মাতৃগাছ শনাক্ত করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

- ১) নিজ ও অন্য এলাকার কৃষকের বাড়ি
- ২) পার্ক বা বাগান এলাকা বা বনাঞ্চল
- ৩) রাস্তার পাশের বৃক্ষ

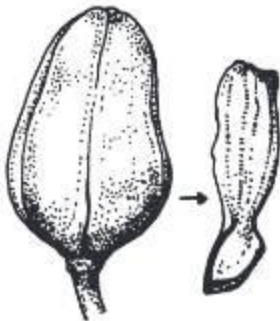
বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি

সাধারণত দুইভাবে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

- ১। **ভূমি হতে বীজ সংগ্রহ :** বীজ পাকার পর যখন কিছু বীজ মাটিতে পড়ে তখন বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বীজ পাকার মধ্যবর্তী সময়ে এ বীজ সংগ্রহ করতে হয়। যেসব গাছের ফল পেকে ফাটে না এবং বীজ ছড়িয়ে পড়ে না সেসব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। সেগুন, গর্জন, শাল, কদম, পিতরাজ, তেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ভূমি থেকে সংগ্রহ করা যায়।
- ২। **গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহ :** এ পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যখন ফল পরিপক্ব হবে তখন দা বা ছুরি দিয়ে গাছের ছোট ছোট ডাল কেটে সরাসরি গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট বীজ যা মাটিতে পড়লে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় ফলে মাটি হতে সরাসরি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সে সব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

ক) পড জাতীয় - বাবলা, কড়ই খ) ক্যাপসিউল- মেহগনি, চম্পা গ) কোণ-পাইন।

গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহের পর রোদে শুকাতে হবে। এরপর পড, ক্যাপসুল বা কোণ ফাটিয়ে বীজ পৃথক করতে হবে।



চিত্র : মেহগনির ক্যাপসুল



চিত্র : কড়ইয়ের পড



চিত্র : পাইন কোণ

বীজ নিষ্কাশন : ফল সংগ্রহ করার পর বীজগুলোকে শাঁস, আবর্জনা, খোসা ইত্যাদি থেকে পৃথক করাই হলো বীজ নিষ্কাশন। বীজ নিষ্কাশনের প্রধান তিনটি পদ্ধতি হলো -

- ১। **বাছাই পদ্ধতি :** যে সব গাছের অঙ্কুরোদগমকাল সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ৪-৭ দিন, এসব ক্ষেত্রে বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। এসব গাছের গোটা ফলই বীজ হিসাবে বপন করা হয়। যেমন-নারিকেল, গর্জন, শাল, সেগুন বীজ। সেগুন বীজ রোদে শুকালে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে।
- ২। **শুকনো পদ্ধতি :** জাবুল, তুলা, ইপিল-ইপিল, মেনজিয়াম, বাবলা, মেহগনি, কড়ই গাছের বীজ শুকনো পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। গাছ থেকে ফল পেড়ে ভালো করে রোদে শুকাতে হয়। ফল ফেটে যখন বীজ বেরিয়ে আসে, তখন মাড়াই করে বীজ নিষ্কাশন করা হয়।
- ৩। **পচন পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে ফল পানিতে পচানোর পর বীজ বের করা হয়, তারপর বাতাসে শুকাতে হয়। যেমন- আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, পেয়ারা ইত্যাদি।

বীজ সংরক্ষণ

গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী বপন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ না করলে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। যেমন- গর্জন, শাল, সেগুন, চাপালিশ, তেলসুর প্রভৃতি গাছের বীজ গুদামজাত করলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়। এসব গাছের বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই বপন করতে হবে। বীজ অপেক্ষাকৃত হালকা করে বিছিয়ে গুদামজাত করা আবশ্যিক। বীজ সব সময় শুকনো রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে বীজ রাখতে হবে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বীজ খোলা অবস্থায় রাখা হয়। আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এবং রেফ্রিজারেটরে এ বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

কাজ : বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবে।

বন নার্সারি তৈরির কৌশল

স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় নার্সারি তৈরির জন্যই প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কিছু নিয়মনীতি।

স্থায়ী নার্সারি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চারা উৎপাদনের জন্য স্থায়ী নার্সারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বন বিভাগ, হটিকালচার, বিএডিসির উদ্যান, প্রাইভেট নার্সারি কেন্দ্রগুলো স্থায়ী নার্সারি। স্থায়ী নার্সারি স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো -

১। স্থান নির্বাচন

আলোবাতাসপূর্ণ খোলামেলা উঁচু ভূমি হবে। বর্ষার পানি ওঠে না এবং জলাবদ্ধতা হয় না এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। উর্বর বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি সম্পন্ন হবে। উন্নত যোগাযোগ ও পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত জমি ও শ্রমিক পাওয়া যায় এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

২। নার্সারির জায়গার পরিমাণ নির্ণয়

এক বর্গমিটার সীড বেড বা পট বেডের জায়গা নির্ণয়

পলিব্যাগের আকার	প্রতি বর্গ মিটারে চারার সংখ্যা
১৫ সেমি x ১০ সেমি	৬৫ টি
১৮ সেমি x ১২ সেমি	৪৫ টি
২৫ সেমি x ১৫ সেমি	২৬ টি
সীড বেডে চারা হতে চারার দূরত্ব	প্রতি বর্গ মিটারে চারার সংখ্যা
৫ সেমি x ৫ সেমি	৪০০ টি
১৮ সেমি x ১২ সেমি	২০০ টি
২৫ সেমি x ১৫ সেমি	১০০ টি

৩। বেড়া নির্মাণ

অনিষ্টকারী জীবজন্তু ও পথচারীদের হাত থেকে চারা গাছ রক্ষা করার জন্য বেড়া দেওয়া দরকার। স্থায়ী নার্সারিতে বেড়া দেওয়ার উপায় -

- ক) ইটের দেয়াল : স্থায়ী নার্সারির চার দিকে উঁচু ইটের দেয়াল নির্মাণ করে বেড়া দেওয়া যায়।
- খ) কাঁটা তারের বেড়া : স্থায়ী নার্সারিতে কাঁটা তারের বেড়া সহজে দেওয়া যায়।
- গ) লোহার জালের বেড়া : লোহার জাল খুঁটির সাথে বেঁধে দিয়ে বেড়ার পাশ দিয়ে জীবন্ত গাছ লাগানো যেতে পারে। কাঁটা তারের বেড়ার মতো এ বেড়াতেও তিন ধরনের খুঁটি ২ মিটার অন্তর অন্তর ব্যবহার করা যায়।
- ঘ) জীবন্ত গাছের বেড়া : দূরন্ত বা কাঁটা মেহেদি, মেন্দী, ঢোল কলমী প্রভৃতি জীবন্ত গাছ দিয়ে নার্সারির চারদিকে স্থায়ী বেড়া দেওয়া যায়।

৪। ভূমি উন্নয়ন

নার্সারি স্থান নির্বাচনের পর পরই উন্নয়নের কাজ করতে হয়। নার্সারি বেড তৈরির স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। মাটি তৈরির সময় বৃষ্টির বা সেচের পানি যাতে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য মাটি ঢালু ও ড্রেন করতে হবে। ভূমির মাটি দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ হতে হবে।

৫। অফিস ও আবাসিক এলাকা

নার্সারির অফিস ঘরটি প্রধান রাস্তার পার্শ্বে মূল গেটের কাছে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন। অফিস ও আবাসিক এলাকা চারা উৎপাদন এলাকার বাইরে রাখতে হবে। নার্সারি এলাকার ভিতরে আবাসন ঠিক নয়।

৬। বিদ্যুতায়ন

স্থায়ী নার্সারিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা ভালো। এতে নার্সারি রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা হয়।

৭। রাস্তা ও পথ

নার্সারিতে প্রবেশের জন্য একটি প্রধান রাস্তা থাকা আবশ্যিক। প্রধান রাস্তাটি পরিকল্পিতভাবে নার্সারির ভিতরের পথগুলোর সাথে যুক্ত থাকবে।

৮। সেচ ব্যবস্থা

নার্সারিতে চারা উত্তোলনের জন্য পানি প্রয়োজন। সে জন্য নার্সারি স্থাপনের শুরুতেই উত্তম সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯। নর্দমা ও নালা

নার্সারিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ কারণে প্রয়োজনীয় নর্দমা ও পার্শ্বনালা ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থায়ী নার্সারিতে এগুলো পাকা করতে হবে। নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১০। নার্সারি ব্লক

নার্সারির চারা উত্তোলনের স্থানকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্লককে আবার কয়েকটি সীড বেড বা পট বেডে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্লকে ১০-১২ টি বেড থাকতে পারে। গ্রিন হাউজ সেড রাখার জায়গা, কমপোস্ট তৈরির গর্ত, মাটি রাখার স্থান ইত্যাদিও সুবিধামতো বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করে দিতে হবে।

১১। নার্সারি বেড

বেড সাধারণত দুই রকম হতে পারে-

- ক) সরাসরি বীজ বপন করে চারা উত্তোলনের জন্য বেড : এ জন্য জমি ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। জমির মাটি কোদাল বা লাঙল দিয়ে আগলা করতে হবে। সব রকম আগাছা নুড়ি পাথর পরিষ্কার করে ভালো করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। অতঃপর জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ১ মিটার \times ৩ মিটার \times ২০ সেমি আকারে বেড তৈরি করতে হবে। বেড তৈরির পর প্রয়োজনীয় গোবর বা কমপোস্ট ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর বীজ বপন করতে হবে।
- খ) পলিব্যাগে চারা উত্তোলনের জন্য বেড তৈরি : এক্ষেত্রে মাটিতে চাষ করার প্রয়োজন নেই। কেবল দুটি বেডের মধ্যবর্তী স্থানের মাটি তুলে বেডকে ১০-১৫ সেমি উঁচু করে উপরিভাগ সমান করতে হয়। এরপর বেডের ধার তৈরি করা হয়। তবে নার্সারি স্থানের প্রযোজ্যতা অনুযায়ী বেডের আকার ছোট বড় হতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী যেকোনো একটি বনজ নার্সারি পরিদর্শন করবে। নার্সারিতে যে সব বৃক্ষের চারা আছে, তার তালিকা তৈরি করে দলগতভাবে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ

বৃক্ষ আমাদের অতিমূল্যবান জাতীয় সম্পদ। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যেমন বৃক্ষ রোপণ করতে হয়, তেমনি একই কারণে বৃক্ষ কর্তন করতে হতে পারে। সাধারণত গাছের আবর্তনকাল শেষ হলে গাছ কর্তন করা হয়। তবে যেসব গাছ সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে লাগানো হয় সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। গাছ কাটা ও তা থেকে কাঠ সংগ্রহ করার বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশল জানা দরকার। গাছ কাটার পর যদি সে গাছকে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা না হয় তবে তা চিরাই করতে হবে এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের কাঠ বের করতে হবে।

এরপর কাঠের স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্য কাঠকে ব্যবহার উপযুক্ত করা বা সিজনিং করা হয়। বাঁশের স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্যও সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় কাঠ বা বাঁশকে সিজনিং করে কর্তিত কাঠ বা বাঁশের গুণগতমান ও স্থায়ীত্বকাল বেশ কয়েকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এ পরিচ্ছেদে আমরা বৃক্ষ কর্তনের সময় ও নিয়মাবলি, কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি, তজ্জা পরিমাপ পদ্ধতি, বৃক্ষকর্তন ও কাঠ সংরক্ষণের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও দক্ষতা অর্জন করব।

বৃক্ষ কর্তন সময় বা আবর্তনকাল

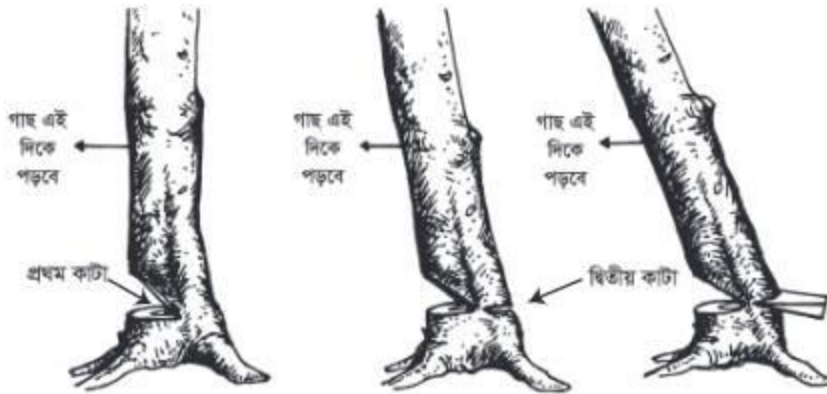
বৃক্ষের চারা রোপণ থেকে শুরু করে যে সময়ে বৃক্ষের বৃদ্ধি সর্বাধিক হয় এবং গাছ পরিপক্বতা লাভ করে ব্যবহার উপযোগী হয়, সে সুনির্দিষ্ট সময়কালকে আবর্তনকাল বা কর্তন সময় বলে। পরিপক্ব হওয়ার আগেই বৃক্ষ কর্তন করলে ভালো মানের কাঠ পাওয়া যায় না। বন ব্যবস্থাপনায় বৃক্ষের আবর্তনকালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

- ১। স্বল্প আবর্তন কাল : যে সব গাছের কাঠ নরম এবং দ্রুত বর্ধনশীল জ্বালানি কাঠ, পশু খাদ্য ও মণ্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, সেসব উদ্ভিদের কর্তন সময় কম হয়। সাধারণত ১০-২০ বছর আবর্তনকালে এসব বৃক্ষ কর্তন করা হয়। যেমন-আকাশমনি, কদম, শিমুল, তেলিকদম, কেওড়া, বাইন, বাবলা, ঝাড়, ইপিল ইপিল ইত্যাদি।
- ২। মাঝারি আবর্তনকাল : আংশিক শক্ত কাঠ প্রদায়ী প্রজাতিসমূহ খুঁটি ও কাঠের উৎপাদনের জন্য ২০-৩০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয়। যেমন-গামার, শিশু, আম, কড়ই, খয়ের, বকুল, হরিতকী, ছাতিয়ান, চন্দন, রেন্ডি কড়ই বা রেইনট্রি ইত্যাদি।
- ৩। দীর্ঘ আবর্তনকাল : শক্তজাতীয় কাঠ ও ধীর বর্ধনশীল প্রজাতিসমূহ শুধুমাত্র কাঠ উৎপাদনের জন্য ৪০-৫০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয়। যেমন- সেগুন, গর্জন, শাল, জারুল, শীলকড়ই, মেহগনি, তেলসুর, চাপালিশ, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি।

বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি

- গাছ যতটা সম্ভব মাটির কাছাকাছি কাটতে হবে। কারণ গাছের গোড়ার অংশটা বেশি মোটা হয়। এ অংশে কাঠের মানও ভালো থাকে। সাধারণত মাটির ১০ সেমি উপরে গাছ কাটলে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাঠ পাওয়া যায়।

- গাছ কাটার পূর্বে ডালপালা ছেটে নিলে গাছ নিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলতে সুবিধা হয়।
- গাছ সব সময় করাত দিয়ে কাটতে হবে। এতে কাঠের অপচয় পুরাপুরি রোধ করা সম্ভব। প্রথমে যে দিকে গাছকে ফেলতে হবে সেদিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে। পরবর্তীতে আগের মতোই বিপরীত দিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে এবং কাটা অংশে খিল বা কাঠের টুকরা ঢুকিয়ে দিতে হবে। এতে গাছ কাজক্ষিত দিকে পড়বে।
- কাটা গাছ মাটিতে পড়ার পর খণ্ডিত করতে হবে। তবে কী কাজে কাঠ ব্যবহার করা হবে তার ভিত্তিতে পরিমাপ নির্ধারিত করতে হবে। খণ্ডিত গোল অংশকে বলা হয় লগ। এ লগকে করাত কলে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার উপযোগী চেরাই কাঠে পরিণত করা হয়। চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব থাকে। চেরাই কাঠের প্রস্থ ১৫ সেমির বেশি হলে এবং পুরুত্ব ৪ সেমি হলে তাকে বলা হয় তক্তা।
- গাছ কাটার সময় যে দিকে গাছ পড়বে প্রথমে কুড়াল দিয়ে মাটির ১০ সেমি উপরে সেই দিকে দুই-তৃতীয়াংশ কাটতে হবে। পরবর্তীতে কাটা হবে ঠিক এ কাটার বিপরীত দিকে ১০ সেমি উপরে। এভাবে গাছ কাটলে গাছকে সুনির্দিষ্ট দিকে ফেলা সম্ভব হয়। এতে পার্শ্ববর্তী গাছের ক্ষতি কম হয়। কুড়াল/করাত উভয় ব্যবহার করে গাছ কাটা বেশ সুবিধাজনক।



চিত্র : গাছ কাটার পদ্ধতি

গোলকাঠ ও চেরাই কাঠের পরিমাপ পদ্ধতি

গোলকাঠের বা লগের সঠিক আয়তন বা ভলিউম নিউটনের সূত্রের সাহায্যে বের করতে হয়।

সূত্র:

$$\text{ভলিউম} = 0.08 \times \frac{(\text{বেড় } ১)^2 + 8 \times (\text{বেড় } ২)^2 + (\text{বেড় } ৩)^2}{৬} \times \text{দৈর্ঘ্য}$$

এখানে, বেড় ১ = চিকন প্রান্তের বেড়

বেড় ২ = লগের মাঝখানের বেড়

বেড় ৩ = মোটা প্রান্তের বেড়

দৈর্ঘ্য ও বেড় মিটারে মাপা হলে ভলিউম হবে ঘনমিটার।

উদাহরণ : একটি গর্জন গাছের লগ ৬ মিটার দীর্ঘ। এটির চিকন মাথার বেড় ১.৫০ মিটার, মাঝখানের বেড় ২.০ মিটার এবং মোটা মাথার বেড় ২.৫ মিটার। লগটির সঠিক আয়তন বা ভলিউম কত?

$$\begin{aligned}
\text{সমাধান : ভলিউম} &= 0.08 \times \frac{(\text{বেড় } ১)^2 + 8 \times (\text{বেড় } ২)^2 + (\text{বেড় } ৩)^2}{৬} \times \text{দৈর্ঘ্য} \\
&= \left\{ 0.08 \times \frac{(১.৫)^2 + 8 \times (২)^2 + (২.৫)^2}{৬} \times ৬ \right\} \text{ ঘনমিটার} \\
&= \left\{ 0.08 \times \frac{২.২৫ + 8 \times ৪ + ৬.২৫}{৬} \times ৬ \right\} \text{ ঘনমিটার} \\
&= \left\{ 0.08 \times \frac{২৪.৫}{৬} \times ৬ \right\} \text{ ঘনমিটার} \\
&= \left\{ 0.08 \times ২৪.৫ \right\} \text{ ঘনমিটার} \\
\text{ভলিউম} &= ১.৯৬ \text{ ঘনমিটার}
\end{aligned}$$

ব্যবহার উপযোগী কাঠের পরিমাপ

গোলকাঠ চেরাইকালে কিছুটা অপচয় হয়। সবটুকু কাঠই ব্যবহার উপযোগী করা যায় না। গোলকাঠ থেকে কী পরিমাণ ব্যবহার উপযোগী কাঠ পাওয়া যায় তা হপ্লাস এর সূত্রের সাহায্যে বের করা হয়।

$$\text{সূত্র : ভলিউম} = \left\{ \frac{\text{লগের মাঝের বেড়}}{8} \right\}^2 \times \text{দৈর্ঘ্য}$$

তজ্জা বা চেরাই কাঠের ভলিউম মাপা সহজ। চেরাই কাঠ/তজ্জার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পুরুত্ব জানা থাকলে অতি সহজেই এর ভলিউম বের করা যায়। একটি পরিমাপ ফিতার সাহায্যে অতি সহজেই এক খণ্ড চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব মাপা যায়। তারপর নিম্নের সূত্রের সাহায্যে ভলিউম নির্ণয় করা যাবে।

$$\text{ভলিউম} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \times \text{পুরুত্ব}$$

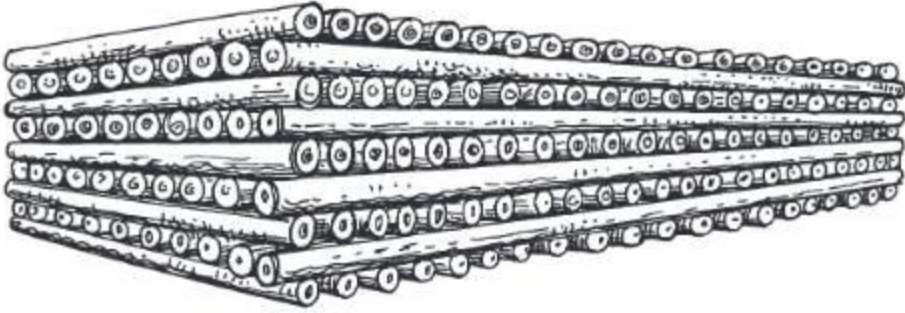
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মিটারে মাপা হলে ভলিউম হবে ঘনমিটারে।

কাঠ সিজনিং ও ট্রিট্রিমেন্ট

জীবন্ত অবস্থায় বৃক্ষের জন্য পানি অপরিহার্য হলেও কাটার পর কর্তিত বৃক্ষে পানির পরিমাণ যত কম থাকবে কাঠ তত বেশি টিকবে। পানির পরিমাণ যদি কাঠ ওজনের ১২% এ নামিয়ে আনা যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে কাঠের গুণগত মান সর্বোত্তম হবে। সহজে ঘুনপোকা, পোকা-মাকড় বা ছত্রাক আক্রমণ করতে পারবে না। বেশি দিন টিকবে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কাঠ থেকে পানি বের করে নেওয়ার পদ্ধতিকে সিজনিং বলে। সিজনিং দুই ভাবে করা যায় -

১। এয়ার ড্রাইং

গাছ কেটে চেরাই করার পর বাতাসে কাঠ শুকানোকে এয়ার ড্রাইং বলা হয়। তবে হালকা পাতলা চেরাই করা কাঠ প্রথমে রোদে শুকালে কাঠ ফেটে বা বেঁকে যেতে পারে। তাই এগুলোকে মাটি থেকে ৩০-৪০ সেমি উঁচুতে ছায়ায় স্তরে স্তরে শুকাতে হয়। এমনভাবে সাজাতে হবে যেন প্রতিটি টুকরার চারপাশে সমভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে। কাঠের ফালি এলোমেলোভাবে বা বাঁকা করে সাজানো যাবে না। এতে করে কাঠ বেঁকে যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে কাঠ সিজনিং হতে কমপক্ষে এক মৌসুম লাগে এবং আর্দ্রতার পরিমাণ ২০%-এর কাছাকাছি থাকে।



চিত্র : এয়ার ড্রাইং

২। কিলন পদ্ধতি

সাধারণত বেশি কাঠ একসাথে সিজনি করার জন্য কিলন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিলন পদ্ধতিতে একটি বড় পাকা বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষ কাঠের তক্তার গায়ে না লাগে এবং দুইটি তক্তার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। এ কাজটি করার জন্য দুইটি তক্তার মধ্যবর্তী স্থানে ৩-৪ সেমি পুরু দুইটি কাঠের টুকরা দুইপাশে বসাতে হবে যাতে দুটি তক্তার মধ্যস্থান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। অতঃপর বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে প্রথমে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করিয়ে কাঠের পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পরবর্তীতে তাপ প্রয়োগ করে সে কক্ষ থেকেও একই সাথে কাঠ থেকে পানি বের করে নেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সিজনিং করে পানির পরিমাণ ১২% এ নামিয়ে আনা যায়। তবে প্রজাতিভেদে সিজনিং এর সময় কম বেশি হতে পারে।

কাঠ সংরক্ষণ

কাঠ ট্রিটমেন্টের মূলনীতি হলো দ্রবণাকারে রাসায়নিক দ্রব্য কাঠ ও বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। সিসিএ (CCA) নামের রাসায়নিক দ্রব্যটি সংরক্ষণী হিসাবে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। সিসিএ সংরক্ষণটি ৩টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে ক্রোমিক অক্সাইড ৪৭.৫%, কপার অক্সাইড ১৮.৫%, আর্সেনিক পেন্টা অক্সাইড ৩৪%, সিসিএ এর মিশ্রণ বাজারে পাওয়া যায়। উপাদানগুলো পৃথক পৃথকভাবে কিনে ও আনুপাতিক হারে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা যায়। পানিতে মিশ্রণটি ২.৫% দ্রবণ তৈরি করা হয়। দ্রবণটি বিশেষ চাপ পদ্ধতিতে কাঠের মধ্যে ঢুকানো হয়। প্রতি ঘনফুট কাঠে সাধারণভাবে ০.৪ পাউন্ড সংরক্ষণী প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠ সংরক্ষণের ৭ দিন পর ব্যবহারযোগ্য হবে। সিসিএ সংরক্ষণী দিয়ে সংরক্ষিত কাঠ পচন প্রতিরোধ করতে পারে। উইপোকাকার আক্রমণও প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

বৃক্ষ কর্তন সংরক্ষণের উপযোগিতা

গাছ লাগানো ও দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যার মাধ্যমে সেগুলো বড় করে তোলার পিছনে নানা উদ্দেশ্য থাকে। তবে যে উদ্দেশ্যেই গাছ লাগানো হোক না কেন সুনির্দিষ্ট আবর্তনকাল শেষে পরিপক্বতা লাভ করলে গাছ কর্তন করাই শ্রেয়। কারণ নির্দিষ্ট সময় পরে গাছের কাঠের মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় গাছের বাকল ফেটে বা রোগাক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। তাছাড়া গাছ কখন কাটতে হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন-

- ১। কাঠ দিয়ে কী করা হবে?
- ২। কোন পরিমাপের কাঠ প্রয়োজন?
- ৩। কী মানের কাঠ প্রয়োজন?
- ৪। এখনই টাকার প্রয়োজন কিনা?
- ৫। গাছ আরও বড় হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা ডালপালায় ছেয়ে যেতে পারে কিনা?
- ৬। ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে বা গাছ উপড়ে পড়ে স্থাপনা বা জানমালের ক্ষতির কারণ হতে পারে কিনা?
- ৭। গাছ কোনো বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা?
- ৮। গাছের আবর্তন কাল শেষ হয়েছে কিনা?

যে কারণেই গাছ কাটা হোক না কেন নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে কাটতে হবে। গাছ সঠিক নিয়মে কর্তন এবং খণ্ডিত করণের মাধ্যমে অপচয় রোধ করা যায়। আর ব্যবহারের আগে বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। বৃক্ষ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। কোনো বন এলাকায় বছরে কী পরিমাণ কাঠ বৃদ্ধি পায় সব সময় তার চেয়ে কম কাঠ আহরণ করতে হবে। এর ফলে বনজ সম্পদ সংরক্ষিত হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে গোলকাঠ বা তক্তা পরিমাপ করে সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখে জমা দেবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ উপকূলীয় বনায়ন

উপকূলীয় বনায়নের ধারণা

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে লবণাক্ততা ও উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রাকৃতিক বন রক্ষা ও সৃষ্টি হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। এসব উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য সারা দেশের পরিবেশের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এজন্য বিস্তৃর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা রোধী, জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে টিকে থাকতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতি রোপণ এবং লবণাক্ততা সহ্যকারী ফসলের চাষ করে উপকূলীয় সবুজ বেটনী সৃষ্টি করা আবশ্যিক। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে মানুষ, পশু-পাখি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা ছাড়াও উপকূলবাসী আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে।

উপকূলীয় বনায়নের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য (ঝাউ গাছ ও দেবদারু গাছ)

উপকূলীয় বনাঞ্চলকে লোনামাটির অঞ্চলও বলা হয়। লোনা মাটির অঞ্চল বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশালের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা ও তৎসংলগ্ন জেগে ওঠা চরাঞ্চলসমূহ। এসব অঞ্চলের প্রধান প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ হলো - নারিকেল, আমড়া, খেজুর, বাবলা, কাজুবাদাম, শিরিষ, রেইনট্রি, তাল, তেঁতুল, সুপারি, জলপাই ইত্যাদি। তবে উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ হিসাবে ঝাউ ও দেবদারু গাছও উল্লেখযোগ্য। এসব উদ্ভিদের মরুজ বৈশিষ্ট্য থাকায় লবণাক্ততা সহ্য করে উপকূলীয় আবহাওয়ার সাথে সহজে খাপখাইয়ে নিতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলের অধিক লোনায়ুক্ত মাটিতে সুন্দরি, গেওয়া, কেওড়া, কাঁকড়া, বাইন, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি ভালো জন্মে। লবণাক্ততার সাথে খাপ খাওয়াতে এসব উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

- উপকূলীয় বনায়নের জন্য বেশি এলাকাজুড়ে শিকড় বিস্তৃত থাকে এরকম গাছ নির্বাচন করতে হবে। এ জন্য উপকূলীয় বনে নারিকেল, সুপারি বা অন্যান্য একবীজপত্রী উদ্ভিদের পরিমাণ বেশি থাকা বাঞ্ছনীয়। এদের শিকড় অনেক এলাকা জুড়ে থাকে বলে মাটির ক্ষয় রোধ করা সহজ হয়। তবে উপকূলীয় বাঁধের বনায়নের ক্ষেত্রে সড়কের পাশের মতো একাধিক স্তরে গাছ লাগাতে হবে। এতে মাটি ক্ষয় কম হবে।
- অন্যান্য বাঁধের মতো উপকূলীয় বাঁধের ক্ষেত্রে যেখানে গাছ লাগানো হয় সে স্থান বেশ ঢালু হয়। তাই সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগাতে হবে। প্রথম লাইন যেখান থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় লাইন তার বরাবর না হয়ে মধ্যবর্তী স্থান থেকে শুরু করা হয়। দূরে দূরে গাছ লাগানো হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি চারা থেকে অন্য চারার দূরত্ব হবে ২ মিটার x ১ মিটার। এর ফলে মাটির ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বাড়বে।
- উপকূলীয় উদ্ভিদের মরুজ বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন পাতার কিউটিকল স্তর খুব পুরু হয়। এ কারণে এসব উদ্ভিদ খরা প্রতিরোধক হয়।
- ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোনের মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারে। কারণ এসব উদ্ভিদের কাণ্ড বেশ লম্বা ও শক্ত হয় এবং শাখা-প্রশাখা কম হয়। যেমন- নারিকেল, গজারি, খেজুর, তাল, ঝাউ,

আকাশমনি, বাবলা, দেবদারু প্রভৃতি।

- উপকূলীয় বাঁধসমূহ দুর্ঘোণের সময় গরু-ছাগলের আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কাজেই গাছ লাগানোর সময় গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয় এরকম গাছও লাগাতে হয়। যেমন- ইপিল ইপিল, আকাশমনি, ধৈর্য প্রভৃতি।
- যে সব উদ্ভিদ জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে উপকূলীয় বনায়নের জন্য সে সব উদ্ভিদ লাগাতে হবে।
- উপকূলীয় বনায়নে শক্ত ও লম্বা কাণ্ড এবং ছোট পাতা ও ডালপালা কর্তন সহনীয় গাছ নির্বাচন করতে হবে। যেমন- শিশু, বাবলা, কড়ই, খেজুর, তাল ইত্যাদি উদ্ভিদ।

ঝাউ গাছ

বর্ণনা : ঝাউ বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ। উচ্চতা ১৫-১৮ মিটারের মতো হয়ে থাকে। বাকল বাদামি ও অমসৃণ। কাঠ খুব শক্ত তবে ফেটে যায়। মে মাসে ফুল হয়। ফল পাকতে এক বছর সময় লাগে। ঝাউ গাছ বনায়নের জন্য বেলেমাটি খুবই কার্যকরী।

প্রাপ্তিস্থান : প্রধানত উপকূলীয় এলাকা তবে দেশের বিভিন্ন স্থানেও ঝাউ গাছ জন্মে থাকে।

বীজ : মে-জুন মাসে-বীজ সংগ্রহ করা হয়।

চারা উত্তোলন : ফেব্রুয়ারি মাসে ঝাউয়ের চারা উত্তোলন করা হয়।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি : ফল সরাসরি গাছ থেকে পাড়তে হয়। ডালের গোড়ার ফল ভালো পরিপক্ব হয় তাই এ ফল সংগ্রহ করা উত্তম। ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে মাড়াই করে বীজ থেকে খোসা আলাদা করা হয়।

বীজ সংরক্ষণ : বীজ রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধক পাত্রে ৫-৭ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

বীজ বপন পদ্ধতি

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বীজতলায় অথবা পলিব্যাগে বীজ বপন করা হয়। বীজতলা ও পলিব্যাগে পরিশোধিত বালির সাথে মিশিয়ে বীজ বপন করা সুবিধাজনক। বীজ গজাতে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে। চারা গজানোর আগেই ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪০-৫০ দিন পর ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা সরিয়ে ফেলতে হবে।

চারা বাছাই ও রোপণ পদ্ধতি

বীজতলায় অতিরিক্ত চারা গজালে কিছু চারা তুলে ফেলতে হয়। আগাছা বাছাই করতে হয়। পলিব্যাগে চারার শিকড় পলিব্যাগের বাইরে এলে কেটে দিতে হয়। ঝাউ গাছ দ্রুত বর্ধনশীল গাছ। ৬ মাস বয়সী বড় চারা রোপণ করা উত্তম। বালিয়াড়ি ও লোনা মাটিতে ঝাউ গাছ ভালো হয়। এ জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের বনায়নের ঝাউ গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার

কোনাকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায় সৌন্দর্যের জন্য সড়ক, মহাসড়কের পাশে রোপণ করা হয়। মাটিতে নাইট্রোজেন উৎপাদনের ক্ষমতা থাকায় এ গাছ উপকূলীয় অঞ্চলে বেশি লাগানো হয়। জ্বালানি হিসাবে এ কাঠ উৎকৃষ্ট। কাঠ খুব শক্ত তাই খুঁটি ও খড়িকাঠ হিসাবেও ব্যবহার হয়।

দেবদারু

বর্ণনা : চির হরিৎ বৃক্ষ, কাণ্ড মোটা, সোজা ও অতি উঁচু হয়। সাধারণত শোভাবর্ধন হিসাবে রোপণ করা হয়ে থাকে। গাছ ৫০-৬০ মিটার লম্বা হয় এবং ৫০০-৬০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ, যৌগিক, দেখতে অনেকটা বর্শার মতো কিন্তু কিনারা ঢেউ খেলানো। সাধারণত অক্টোবর মাসে ফুল হয়, ফল পাকে দেরিতে। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এ গাছ পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময় : জুলাই-আগস্ট।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি : পাকা ফল কালো রঙের হয়। ফল পাকলে গাছ থেকে বা গাছ তলা থেকে সংগ্রহ করে বস্তায় রেখে পচিয়ে পানিতে ধুয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। দেবদারু বীজ সংরক্ষণ করা যায় না বলে সংগ্রহ করার সাথে সাথে তা বীজ তলায় বা পলিব্যাগে বপন করতে হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি : প্রতি পলিব্যাগে ২টি করে বীজ বপন করতে হয়। প্রাথমিকভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম হার শতকরা ৯০ ভাগ। ৭-১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হয়।

রোপণের সময় চারার বয়স : দেড় থেকে দুই বছর বয়সের চারা সড়কের পাশে, বাগানের ও উপকূলীয় অঞ্চলে জুন-জুলাই মাসে রোপণ করা উত্তম।

ব্যবহার : দেবদারু কাঠ হালকা ও নরম। টিনের ধারের ফ্রেম, পাটাতন, দেশলাই ও প্যাকিং বক্স তৈরিতে দেবদারু কাঠ ব্যবহার হয়। কাগজের মণ্ড তৈরিতেও দেবদারু কাঠ ব্যবহৃত হয়।

উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেটনী তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা গেলে বহুবিধ উপকার সাধিত হবে। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও টর্নেডোর প্রকোপ থেকে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষা করা। জ্বালানি ও খাদ্যের চাহিদা মোটানো, অর্থ উপার্জন, ভূমিক্ষয় রোধ ইত্যাদি প্রয়োজনে উপকূলীয় বনায়ন সৃষ্টি ও তা রক্ষাবেক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য। উপকূলীয় বনাঞ্চলের উপযোগিতাসমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নরূপ উপায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ক) পরিবেশগত উপযোগিতা

- এ বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি উপকূল অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ভূ-নিম্নস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি করে।
- ভূমির লবণাক্ততা হ্রাস করে পরিবেশ জীবকুলের বাস উপযোগী করতে সাহায্য করে।
- পরিবেশের অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে, উদ্ভাপ সৃষ্টি রোধ করে এবং বাতাস পরিশোধন করে।
- উপকূলীয় সবুজ বেটনী উপকূলীয় অঞ্চলে সৃষ্ট সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও সাইক্লোনের কবল থেকে মানুষ ও জীব জন্তুকে রক্ষা করে।
- ভূমিধস, বালিয়াড়ি ও ঝড়রোধ করে এবং বৃষ্টিপাত হতে সহায়তা করে।

- এ বনাঞ্চল মানুষ, পাখি, জীবজন্তু ও পোকামাকড়ের নিরাপদ আবাস তৈরি ও রক্ষা করে এবং খাদ্যের জোগান দেয়। ফলে অত্র এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।
- উপকূলীয় বনায়ন আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন ও এর জীবজন্তুকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবী বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন হিসাবে খ্যাত এ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে উপকূলীয় সাতনা বেষ্টনী সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই।

খ) নান্দনিক উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের ফলে যে নির্মল সবুজ বেষ্টনী তৈরি হয়, তার নান্দনিক সৌন্দর্য অতীতপূর্ব। এ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশের বহু ভ্রমণবিলাসী মানুষের সমাগম ঘটে। হরেক রকম পশুপাখির আবাসস্থল তৈরি হয়, যাপরিবেশের অসীম উপকার সাধন করে এবং নান্দনিকতায় নবতর সংযোজন ঘটায়।

গ) অর্থনৈতিক উপযোগিতা

- উপকূলীয় বনাঞ্চলে বৃক্ষরাজির অর্থনৈতিক উপযোগিতা অপরিসীম। এ বনাঞ্চলে ভ্রমণকারী দেশ-বিদেশের পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ সম্প্রসারিত হয়। যার ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
- ফলজ উদ্ভিদ যেমন- নারিকেল, খেজুর, তাল, কলা, আম প্রভৃতি থেকে উৎপাদিত ফসল উপকূলীয় মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়।
- বনাঞ্চলে উৎপাদিত মধু ও মোম থেকে অর্থ উপার্জিত হয়। ফুল, ফল ও পল্লবগুচ্ছ থেকে খাদ্যশস্য, শাকসবজি, পাখির খাদ্য, পশুখাদ্য পাওয়া যায়।
- উদ্ভিদরাজির কাণ্ড ও শাখা থেকে জ্বালানি কাঠ, খুঁটি, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, যানবাহন, কৃষি উপকরণ, রেলওয়ে স্লিপার ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ -

- ক. ১২.১৬ লক্ষ হেক্টর
গ. ১৪.১৬ লক্ষ হেক্টর

- খ. ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর
ঘ. ১৫.১৬ লক্ষ হেক্টর

২. নিচের কোন বৃক্ষগুচ্ছ পাহাড়ি বনের?

- ক. গর্জন, গরান, গামার।
গ. তেলসুর, চম্পা, চাপালিশ।

- খ. গজারি, গেওয়া, সেগুন।
ঘ. জাবুল, রেইনট্রি, পশুর।

৩. বাংলাদেশের অধিকাংশ বনভূমি অবস্থিত -

- i. দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে।
ii. দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে।
iii. উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
গ. ii ও iii

- খ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তিয়া টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে বনের উপর প্রামাণ্যচিত্র দেখছিল। একপর্যায়ে সে দেখতে পেল ঐ বনের অধিকাংশ গাছের ফল গাছে থাকা অবস্থায়ই অঙ্কুরোদগম হচ্ছে এবং চারাগাছ গজানোর পর তা মাটিতে পড়ে কাদায় গৈথে যাচ্ছে।

৫. তিয়ার দেখা অঙ্কুরোদগম নিচের কোন উদ্ভিদে দেখা যায়?

- ক. গরান
গ. গর্জন

- খ. গামার
ঘ. গজারি

৬. তিয়ার দেখা বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হলো -

- i. মাটি কদমাক্ত থাকে।
ii. বায়ুবীয়মূল বিদ্যমান।
iii. শাখামূল দীর্ঘ হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
গ. ii ও iii

- খ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জামান সাহেব কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মতো তার বাড়ির দক্ষিণ দিকে পুকুর পাড়ে উঁচু ৪ শতক জমিতে মেনজিয়াম বীজ রোপণ করেন। এ জন্য তিনি ১৫ সেমি \times ১০ সেমি আকারের পলি ব্যাগ ব্যবহার করেন। এতে করে জামান সাহেব ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।
 - ক. নার্সারি কাকে বলে?
 - খ. নার্সারি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।
 - গ. জামান সাহেবের নার্সারির চারার সংখ্যা নির্ণয় করো।
 - ঘ. জামান সাহেবের সফলতার কারণ বিশ্লেষণ করো।
২. সুফিয়া বেগম বাড়ি তৈরির সময় গৃহে ব্যবহারের জন্য ২০ বছর পূর্বে লাগানো দুইটি মেহগনি গাছ কেটে ফেলেন। গাছ দুইটি কাটার সময় শ্রমিকরা কুঠার ব্যবহার করেন। তার গাছ ২টির লগের দৈর্ঘ্য ছিল ৮ মিটার, চিকন মাথার বেড় ২ মিটার, মাঝের অংশের বেড় ২.৫ মিটার ও মোটা মাথার বেড় ছিল ৩ মিটার।
 - ক. কাঠ সিজনিং কী?
 - খ. আবর্তন কালের ভিত্তিতে গামার, শিশু কোন ধরনের উদ্ভিদ ব্যাখ্যা করো?
 - গ. সুফিয়া বেগমের একটি গাছের ভলিউম নির্ণয় করো।
 - ঘ. সুফিয়া বেগমের গৃহীত কার্যক্রমটি সঠিক ছিল কি না বিশ্লেষণ করো।